কাচের কফিন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

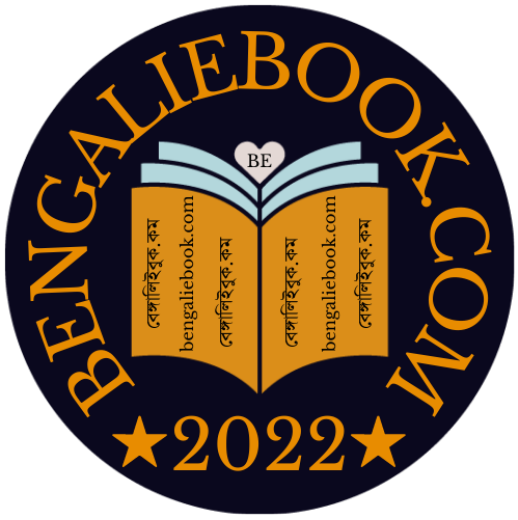

কাচের কফিন

।।এক।। খুনের না মানুষ চুরির মামলা

–বোলো না, বোলো না, আজ আমাকে চা খেতে বোলো না! ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন সুন্দরবাবু।

মানিক সবিস্ময়ে শুধোলে, এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।

–না আজ কিছুতেই আমি চা খাব না। একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ?

–হুম! জয়ন্ত বললে, বেশ, চা না খান, খাবার খাবেন তত?

–কী খাবার?

–টিকিয়া খাবার।

–ও তাই নাকি।

–তারপর আছে ভেন্ডালু।

–হংস মাংস?

–হ্যাঁ, বনবাসী হংস।

সুন্দরবাবু ভাবতে লাগলেন।

–খাবেন তো?

সুন্দরবাবু ত্যাগ করলেন একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস। তারপর মাথা নেড়ে করুণ স্বরে বললেন, উহুঁম! আজ আ ক হংস-মাংস ধ্বংস করতে বোলো না।

মানিক বললে, হালে আর পানি পাচ্ছি না। হংস-মাংসেও অরুচি! সুন্দরবাবু এইবারে বোধ হয় পরমহংস হয়ে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করবেন।

—মোটেই নয়, মোটই নয়।

—তবে গেরস্তের ছেলে হয়েও এ-খাব না ও-খাব না বলছেন কেন?

—আজ আমার উদর দেশের বড়োই দুরবস্থা।

–অমন হৃষ্টপুষ্ট উদর, তবুও

—আমার উদরাময় হয়েছে।

—তাই বলুন। তবে ওষুধ খান। আমি হোমিওপ্যাথি জানি! এক ডোজ মার্কসল ওষুধ দেব নাকি?

–থো করো তোমার হোমাপাথির কথা। আমি খাবার কি ওষুধ খেতে আসিনি। আমি এসেছি জরুরি কাজে।

—অসুস্থ দেহ, তবু কাজ থেকে ছুটি নেননি? কী টনটনে কর্তব্যজ্ঞান।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। স্বর্গবাসী টেকি ধান ভাঙে। পুলিশের আবার ছুটি কী হে?

জয়ন্ত শুধোলে, নতুন মামলা বুঝি?

—তা ছাড়া আর কী?

–কীসের মামলা?

—বলা শক্ত। খুনের মামলা কি মানুষ চুরির মামলা, ঠিক ধরতে পারছি না।

একটু একটু করে জাগ্রত হচ্ছিল জয়ন্তের আগ্রহ। সে সামনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, সুন্দরবাবু ওই চেয়ারে বসুন। ব্যাপারটা খুলে বলুন।

আসন গ্রহণ করে সুন্দরবাবু বললেন, এটাকে আজব মামলা বলাও চলে। রহস্যময় হলেও অনেকটা অর্থহীন। নাটকের পাত্র-পাত্রী হচ্ছেন তিনজন। একজন নারী আর দুজন

পুরুষ। ওঁদের মধ্যে একজন পুরুষ হচ্ছেন আসামি। কিন্তু তিনজনেই অদৃশ্য হয়েছে।

—অদৃশ্য হবার কারণ?

-শোনো! বছর দেড়েক আগে সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরি নামে এক ভদ্রলোক থানায় এসে অভিযোগ করেন, তাঁর পিতামহী সুশীলাসুন্দর দেবীর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। সুশীলা দেবী বিধবা। তিনি তার স্বামীর বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী। তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার দরুন ডাক্তার মনোহর মিত্রের চিকিৎসাধীন ছিলেন। সুশীলা দেবী হঠাৎ একদিন একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে মনোহর মিত্রের সঙ্গে বাড়ির বাইরে চলে যান, তারপর ফিরে আসেননি। খোঁজাখুঁজির পর প্রকাশ পায়, অদৃশ্য হবার দুদিন আগে সুশীলা দেবী ব্যাংক থেকে নগদ পনেরো লক্ষ টাকা তুলে আনিয়েছিলেন। সে টাকাও উধাও হয়েছে।

—ডাক্তার মনোহর মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের খ্যাতি আমি শুনেছি। পদার্থশাস্ত্রে তার নাকি অসাধারণ পাণ্ডিত্য।

—তিনিই ইনি। মনোহরবাবুকে তুমি কখনও চোখে দেখেছ?

—না।

—আমিও দেখিনি, তবে তার চেহারার হুবহু বর্ণনা পেয়েছি।

–কী রকম?

–মনোহরবাবুর দীর্ঘ পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বেশি হবে না, কিন্তু তাঁর দেহ রীতিমতো চওড়া। তার মাথায় আছে প্রায় কঁধপর্যন্ত ঝুলে পড়া সাদা ধবধবে চুল, মুখেও লম্বা পাকা দাড়ি। তাঁর বয়সও ষাটের কম নয়। কিন্তু শরীর এখনও যুবকের মতো সবল। রোজ সকালে সূর্য ওঠবার আগে পদব্রজে অন্তত চার মাইল ভ্রমণ করে আসেন। তার চোখ সর্বদাই ঢাকা থাকে কালো চশমায়। টিকলো নাক। শ্যামবর্ণ। সাদা পাঞ্জাবি, থান কাপড় আর সাদা ক্যাম্বিসের জুতো ছাড়া তন্য কিছু পরেন না। বর্মা চুরোটের অত্যন্ত ভক্ত। তার মুখ। সর্বক্ষণই গম্ভীর। ডান কপালের উপরে একটা এক ইঞ্চি লম্বা পুরানো কাটা দাগ আছে। হাতে থাকে একগাছা রুপাবাঁধানো মোটা মালাক্কা বেতের লাঠি।

জয়ন্ত বললে, আরে মশাই, এ বর্ণনার কাছে যে আলোকচিত্রও হার মানে। এর পর বিপুল জনতার ভিতর থেকেও মনোহরবাবুকে আবিষ্কার করতে পারব।

সুন্দরবাবু দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, আমি কিন্তু দেড় বৎসর চেষ্টা করেও তার টিকিও আবিষ্কার করতে পারলুম না।

–কেন?

–তিনিও অদৃশ্য হয়েছেন!

–তাঁর বাড়ি কোথায়?

–বালিগঞ্জে নিজের বাড়ি। সেখানে গিয়েছিলুম। কিন্তু বাড়ি একেবারে খালি।

–মনোহরবাবুর পরিবারবর্গ?

–মাথা নেই, তার মাথাব্যথা। তিনি বিবাহই করেননি।

–অন্য কোনও আত্মীয়-স্বজন?

কারুর পাত্তা পাইনি। পাড়ার লোকের মুখে শুনলাম মনোহরবাবু জনচারেক পুরাতন আর বিশ্বস্ত ভৃত্য নিয়ে ওই বাড়িতে বাস করতেন বটে, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকলকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছেন।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে আপনি বললেন, সুশীলা দেবী ট্যাক্সিতে চড়ে মনোহরবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কি নিজের মোটর নেই?

—আছে বই কি! একখানা নয়, তিনখানা।

—তাহলে মেনে নিতে হয়, সুশীলা দেবীর নিজেরও ইচ্ছা ছিল, তিনি কোথায় যাচ্ছেন কেউ জানতে না পারে।

—হয় তোমার অনুমান সত্য, নয় তিনি ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন মনোহরবাবুর পরামর্শেই!

—আপনি ট্যাক্সিখানার সন্ধান নিয়েছেন?

-নিয়েছি বই কি! ট্যাক্সি চালককে খুঁজে বের করেছি। সে আরোহীদের হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। আর কিছুই সে জানে না।

—তা হলে মনোহরবাবুর সঙ্গে সুশীলা দেবী বোধ হয় কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছেন। কিন্তু কলকাতার বাইরে কোথায়?

-হুম, আমিও মনে মনে এই প্রশ্ন বার বার করেছি। কোথায়, কোথায়, কোথায়? কিন্তু প্রতিধ্বনি বার বার উত্তর দিয়েছে—কোথায়, কোথায়, কোথায়?

-খালি ওই প্রশ্ন নয় সুন্দরবাবু, আরও সব প্রশ্ন আছে। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পনেরো লক্ষ টাকা নিয়ে সুশীলা দেবী রুগ্ন দেহে এমন লুকিয়ে মনোহরবাবুর সঙ্গে চলে গেলেন। কেন? তিনি বেঁচে আছেন কি নেই? মনোহরবাবু বিখ্যাত পদার্থবিদ হলেও মানুষ হিসাবে কি সাধু ব্যক্তি নন?

সুন্দরবাবু বললেন, আমার কথা এখনও ফুরোয়নি। সবটা শুনলে প্রশ্ন সাগরে তোমাকে তুলিয়ে যেতে হবে।

—আমার আগ্রহ যে জ্বলন্ত হয়ে উঠল। বলুন, সুন্দরবাবু বলুন।

।। দুই ।। মানুষ না দেখে প্রতিকৃতি আঁকা

সুন্দরবাবু বললেন, যে-মাসে সুশীলা দেবী অন্তর্হিত হন, সেই মাসেই আর একটা মানুষ নিরুদ্দেশ হওয়ার মামলা আমার হাতে আসে। দুটো মামলাই কতকটা একরকম। গোবিন্দলাল। রায় একজন বড়ো জমিদার। বয়স সত্তরের কম নয়। তিনি বিপত্নীক হলেও সংসার তার বৃহৎ। পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, পৌত্র-পৌত্রীও আছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন গোপনে ব্যাংক থেকে নগদ বারো লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে তিনিও গিয়েছেন অজ্ঞাতবাসে। তবে গোবিন্দবাবু যাবার সময়ে একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল— আমি বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছি। ফিরতে বিলম্ব হবে। তোমরা আমরা জন্য চিন্তিত হয়ো না। তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজখবর নেই। তিন মাসের মধ্যেও বৃদ্ধ পিতার কাছ থেকে একখানা পত্র পর্যন্ত না পেয়ে তার পুত্ররা আমার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি গোবিন্দবাবুর নাগাল ধরতে পারিনি।

জয়ন্ত শুধোলে, আপনি কি মনে করেন, আগেকার মামলার সঙ্গে এ মামলাটারও কোনও সম্পর্ক আছে!

—অল্পবিস্তর মিল কি নেই জয়ন্ত? একজন অতি বৃদ্ধা নারী আর একজন অতি বৃদ্ধ পুরুষ, দুজনেই গোপনে অজ্ঞাতবাসে গমন করেছেন, আর দুজনেই যাবার ঠিক আগেই ব্যাংক থেকে বহু লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছেন, দুজনেই আত্মগোপন করবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদের কোনও প্রমাণই দেননি।

–কিন্তু গোবিন্দবাবুর সঙ্গে কি মনোহরবাবুর পরিচয় ছিল?

–গোবিন্দবাবুর বাড়ির কোনও লোকই মনোহরবাবুর নাম পর্যন্ত শোনেনি।

–তাহলে আপনি কী বলতে চান?

–মাসখানেক আগে গোবিন্দবাবুর বড়ো ছেলে আমার হাতে একখানা পত্র দিয়ে বলে গিয়েছেন–একখানা বইয়ের ভিতর থেকে এই চিঠিখানা পেয়েছি। চিঠিখানা পড়বার পর বাবা নিশ্চয়ই ওই বইয়ের ভিতর খুঁজে রেখেছিলেন।– জয়ন্ত এই নাও, চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো।

জয়ন্ত খামের ভিতর থেকে পত্র বার করে নিয়ে পাঠ করলে–

প্রিয় গোবিন্দবাবু,

এতদিন পরে আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত হয়েছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দলাভ করলুম। বেশ, আগস্ট মাসের চার তারিখে পাঁচটার সময়ে আমার লোক হাওড়া স্টেশনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাকে সঙ্গে করে আনতে হবে অন্তত নগদ বারো লক্ষ টাকা। যতদিন না আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন আমরা এইখানে বাস করব। আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন। আপনার কোনও আশঙ্কা নেই। পত্রের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

ইতি–
ভবদীয়
শ্রীমনোহর মিত্র

সুন্দরবাবু বললেন, পড়লে?

জয়ন্ত উত্তর দিলে, হুম, চিঠির কাগজে কোনও ঠিকানা নেই? কিন্তু খামের উপরে ডাকঘরের নাম রয়েছে, সুলতানপুর।

—সুলতানপুর হচ্ছে একটি ছোটোখাটো শহর! সেখানে আমি গিয়েছিলুম। কিন্তু ডাক্তার মনোহর মিত্রের নাম পর্যন্ত কেউ সেখানে শোনেনি।

-সুলতানপুর ডাকঘর থেকে কোন কোন গ্রামের চিঠি বিলি হয় সে খোঁজ নিয়েছিলেন। তো?

-তা আবার নিইনি? শুধু খোঁজ নেওয়া কী হে সব জায়গাতেই নিজে গিয়ে ফুঁ মারতেও ছাড়িনি। কিন্তু লাভ হয়েছে প্রকাণ্ড অশ্বডিম্ব।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল নীরবে।

সুন্দরবাবু বললেন, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো? মনোহর নাম ভাড়িয়ে কিছুদিন ও অঞ্চলের কোথাও বাস করেছিল। তারপর সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবুকে হাতে পেয়ে হত্যা করে তাদের টাকাগুলো হাতিয়ে আবার সরে পড়েছে কোনও অজানা দেশে!

জয়ন্ত সেন নিজের মনেই বললে, চিঠি পড়ে জানা গেল, মনোহরবাবুর কোনও প্রস্তাবে গোবিন্দবাবু প্রথমে রাজি হননি, কিন্তু পরে রাজি হয়েছিলেন। খুব সম্ভব সেই প্রস্তাবটাই কার্যে পরিণত করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন বারো লক্ষ টাকা।

-হুম, কে বলতে পারে সুশীলা দেবীর কাছেও মনোহর ঠিক এই রকম প্রস্তাব করেনি?

—কিন্তু কী এই প্রস্তাব, যার জন্যে লোকে এমন লক্ষ টাকা খরচ করতে রাজি হয়?

-কেবলই কি টাকা খরচ করতে রাজি হয়, ধাপ্পায় ভুলে সংসার-পুত্র-কন্যা-আত্মীয় ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে যেতেও কুণ্ঠিত হয় না।

–সুন্দরবাবু, প্রস্তাবটা যে অতিশয় অসাধারণ সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই! সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত, মনোহরের প্রস্তাব নিয়ে বেশি মস্তিষ্কচালনা করে কেনোই লাভ নেই।

–লাভ আছে বই কি! প্রস্তাবটা কী জানতে পারলে আমাদের আর অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হয় না।

–কিন্তু যখন তা আর জানবার উপায় নেই তখন আমাদের অন্ধকারেই ঢিল ছুড়তে হবে বই কি!

–অন্ধকারে বহু ঢিল তো ছুড়েছেন, একটা ঢিলও লক্ষে গিয়ে লাগল কি!

–তুমি আমাকে আর কী করতে বলো?

–আপনি তো সর্বাগ্রে মনোহরবাবুকে আবিষ্কার করতে চান?

–নিশ্চয়ই!

–তাহলে আমাদের সঙ্গে আর একবার সুলতানপুর চলুন।

–সেটা হবে ডাহা পণ্ডশ্রম। কারণ সে-অঞ্চলের কোনও পাথরই আমি ওলটাতে বাকি রাখিনি।

-না, একখানা পাথর ওলটাতে আপনি ভুলে গিয়েছেন।

-কোনখানা শুনি?

–যথাসময়ে প্রকাশ পাবে। সুন্দরবাবু একটু নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, বেশ তাই সই।

–মানিক সব শুনলে।

–এখানে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

-ফরমাজ করো।

-তোমার ছবি আঁকার হাত খুব পাকা!

-তুমি ছাড়া আর কেউ ওকথা বলে না!

—এখন আমায় কী করতে হবে তাই বলো।

—মনোহরবাবুর আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি আগে তুমি সুন্দরবাবুর কাছ থেকে ভালো করে আর-একবার শুনে নাও। তারপর এমন একটি মনুষ্য মূর্তি আঁকো, যার মধ্যে থাকবে ওই বিশেষত্বগুলি।

সুন্দরবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, ও-রকম ছবি এঁকে কী লাভ হবে?

-ওই ছবির সাহায্যে হয়তো আসামিকে শনাক্ত করা যাবে।

-জয়ন্ত কী যে বকে তার ঠিক নেই। মনোহরকে আমিও দেখিনি, মানিকও দেখেনি। আমি খেয়েছি পরের মুখে ঝাল! সাত সকালে আমল খাস্তা! মানিক শিব গড়তে বানর গড়ে বসবে। ছবি দেখে মনোহরকে চেনাই যাবে না।

—ফলেন পরিচিয়তে সুন্দরবাবু, ফলেন পরিচিয়তে! অর্থাৎ ফলের দ্বারা চেনা যায় বৃক্ষকে। আসল তাৎপর্য হচ্ছে, আকৃতির দ্বারা মানুষকে না চিনলেও তার ব্যবহারের দ্বারা তাকে চেনা যায় অনায়াসেই। বহু অভিজ্ঞতার ফলেই এরকম এক একটি প্রবাদ বাক্য রচিত হয় বুঝলেন মশাই।

তবু সুন্দরবাবুর মন মানল না, তিনি বললেন, তুমি কেবল নিজের মনগড়া কথাই বলছ, একটা প্রমাণও তো দিতে পারলে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলল, একটা কেন, অনেক প্রমাণই দিতে পারি।

–তাই নাকি? এ দেশের কোনও গোয়েন্দা যে এমন বর্ণনা শুনে প্রতিকৃতি এঁকে অপরাধী গ্রেপ্তার করেছে আমি তো কখনও তা শুনিনি।

–এদেশের কথা শিকেয় তুলে রাখুন সুন্দরবাবু এদেশের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের গোয়েন্দারা অনেক বারই এমনি বর্ণনা শুনে আঁকা প্রতিকৃতির সাহায্যে আসল অপরাধীকে বন্দি করতে পেরেছে।

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, বটে, বটে? আমি তো জানতাম না।

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, আপনি অনেক কিছুই আগে জানতেন না। এখনও জানেন, আবার না জানালে ভবিষ্যতেও জানতে পারতেন না। তবু জানতে গেলেও এত বেশি তর্ক করেন কেন বলুন দেখি?

সুন্দরবাবু দীপ্ত নেত্রে কেবল বললেন, হুম!

জয়ন্ত বললে, জানাজানি নিয়ে হানাহানি ছেড়ে দাও মানিক। এখন বর্ণনা শুনে মনোহরের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করো। কালই আমরা সুলতানপুরে যাত্রা করব।

।। তিন ।। সিদ্ধেশ্বরবাবুর চিঠি

সুলতানপুর ছছাটো শহর হলেও তিনটি রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত বলে এখানে লোকজনের সংখ্যা বড়ো অল্প নয়।

শহরের ভিতর দাঁড়িয়ে দেখা যায় সুলতানপুরের বাইরের চারি দিকে প্রকৃতি যেন নিজে ভাণ্ডার উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে অজস্র সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য।

মানিক বললে, জয়ন্ত, এমনি সব জায়গাতেই জন্মলাভ করে কবির কল্পনা! জয়ন্ত বলল, কিন্তু আমরা কবি নই।

সুন্দরবাবু বললে, আমরা ঠিক তার উলটো। আমরা এখানে কাল্পনিক মিথ্যার সঙ্গে মিতালি করতে আসিনি, আমরা এসেছি বাস্তব সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

ফাঁক পেলে মানিক ছাড়ে না। বললে, সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে? সে কী সুন্দরবাবু সত্য কি আপনার শত্রু?

সুন্দরবাবুর বদনমণ্ডলে ঘনিয়ে উঠেছিল অন্ধকার, কিন্তু জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তার পক্ষ অবলম্বন করে বললে, না মানিক, সুন্দরবাবু বোধ করি বলতে চান, উনি এসেছেন সত্যের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

সুন্দরবাবুর মুখ তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি বললেন, জয়ন্ত ঠিক ধরেছে। আমি তো ওই কথাই বলতে চাই।

–পোস্ট অফিস। যাবে নাকি?

–পরে বিবেচনা করব। কলকাতার বিখ্যাত চৌধুরি ব্যাংকের একটা শাখা এখানে আছে না?

-হ্যাঁ সেটি এখানকার প্রধান ব্যাংক।

-একবার সেই ব্যাংকে যেতে চাই। -কেন বলো দেখি?

–সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন। চৌধুরি ব্যাংক। দোতলায় উঠে দেখা গেল, একটি বিলাতি পোশাক পরা যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রবল বাতাসে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

তাকে দেখেই মানিক বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, একী করুণা!

–আরে মানিক নাকি? এখানে যে?

–এই ব্যাংকের ম্যানেজারকে একটু দরকার।

–আমিই এখানকার ম্যানেজার।

–সে কী হে, কবে থেকে?

–বছর তিনেক তুমি তো আমাদের পাড়া আর মাড়াও না, জানবে মেন করে? এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

–ইনি হচ্ছেন সুন্দরবাবু–ডাকসাইটে পুলিশ কর্মচারী। ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু জয়ন্ত, আমার মুখে এর কথা নিশ্চয় তুমি অনেকবার শুনেছ। আর জয়ন্ত এটি হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু করুণা ভট্টাচার্য, আমার মামার বাড়ির পাশেই এদের বাড়ি।

করুণা বললে, আপনাদের মতো মহাবিখ্যাতরা এই ধারধারা গোবিন্দপুরে কেন? আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, আগে আমার ঘরে এসে বসুন।

পাশেই ম্যানেজারের ঘর। সকলে আসন গ্রহণ করলে পর নিজেও টেবিলের সামনে গিয়ে বসে করুণা বললে এইবার আপনাদের জন্যে কী করতে পারি আদেশ করুন।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, আদেশ-ফাদেশ কিছুই নয়। প্রথমেই একটি বিনীত নিবেদন আছে। বলতে পারেন, সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী বাঙালি এমন কে আছেন যিনি আপনাদের মক্কেল।

করুণা বললে, বিচিত্র প্রশ্ন। সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকায় কিছু কিছু বাঙালি আছেন। বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই সম্পন্ন গৃহস্থ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক।

–সেই একজন কি খুব ধনী?

–আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকে ধনকুবের বলাও চলে হয়তো।

–তিনি কি আপনাদের মক্কেল?

–আমাদের একজন প্রধান মক্কেল।

–তিনি কোথায় থাকেন?

–এখান থেকে তিন মাইল দূরে আছে বেগমপুরা নামে একটি জায়গা। সেখান থেকেও মাইল দুয়েক তফাতে দস্তুরমতো গহন বনের ভিতরে তার বাংলোর ধরনে তৈরি মস্ত বাড়ি।

–অতবড়ো ধনী এমন নির্জন জায়গায় থাকেন কেন?

–শুনতে পাই তিনি ভারী খেয়ালি লোক।

–তাঁর নাম কি ডাক্তার মনোহর মিত্র?

–আজ্ঞে না, তাঁর নাম সিদ্ধেশ্বর সেন।

জয়ন্ত চুপ করে রইল গম্ভীর মুখে।

সুন্দরবাবু মুরব্বিয়ানা চালে ঘাড় নাড়তে নাড়তে গাল ভরা হাসি হেসে বললেন, তুমি আমায় টেক্কা মারবে বলে এখানে এসেছ। কিন্তু দেখছ তো ভায়া, আমি কোনও পাথর ওলটাতেই বাকি রাখিনি।

জয়ন্ত নিরুত্তর মুখে পকেট থেকে মানিকের আঁকা সেই ছবিখানা বার করে ধীরে ধীরে বললে, করুণাবাবু, এই ছবির মানুষটিকে কোনও দিন কি আপনি স্বচক্ষে দর্শন করেছেন?

করুণা ছবির উপর ঝুঁকে পড়ল। এবং তারপরেই বিনা দ্বিধায় বলে উঠল, এই ছবির সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মুখ ঠিক ঠিক মিলছে না বটে, তবে এ খানা যে সিদ্ধেশ্বরবাবুর প্রতিকৃতি সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই।

জয়ন্ত অপাঙ্গে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেঁট করে ফেললেন সুন্দরবাবু।

।। চার ।। কাচের কফিন

–করুণাবাবু, আপনাদের এই সিদ্ধেশ্বরবাবুর কথা আরও কিছু বলতে পারেন? জিজ্ঞাসা করলে জয়ন্ত।

–একে আপনি মানিকের প্রাণের বন্ধু; তার উপরে আপনার মতো লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করবার সুযোগ পাওয়াও পরম সৌভাগ্য, আপনি কী জানতে চান বলুন?

–সিদ্ধেশ্বরবাবু কবে কত দফায় আপনাদের ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছেন? করুণা স্তব্ধ হয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললে, দেখুন এরকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে উচিত নয়, কারণ সিদ্ধেশ্বরবাবু হচ্ছেন আমাদের একজন প্রধান মক্কেল। কিন্তু আপনাদের কথা স্বতন্ত্র, বিশেষত সুন্দরবাবু হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী। এক্ষেত্রে আমরা আদেশ পালন করতে বাধ্য। আপাতত আমার স্মৃতি থেকেই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করব। দরকার হলে পরে খাতাপত্র দেখে সঠিক তার টাকার পরিমাণ আপনাকে জানাতে পারি। শুনুন, সিদ্ধেশ্বরবাবু তার বাংলোবাড়ি তৈরি হবার পর এ অঞ্চলে প্রথম আসেন প্রায় দুই বছর আগে। সেই সময় আমাদের ব্যাংকে জমা রাখেন ছয় লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বারে প্রায় বছর দেড়েক আগে তিনি এই ব্যাংকে জমা রাখেন ছয় লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বারে প্রায় বছর দেড়েক আগে তিনি এই ব্যাংকে পনেরো লক্ষ টাকা জমা দেন। তৃতীয় বারে সেও বোধহয় দেড় বছরের কাছাকাছি, সিদ্ধেশ্বরবাবুর কাছ থেকে আবার আমরা বারো লক্ষ টাকা পাই। অর্থাৎ মোট তেত্রিশ লক্ষ টাকা।

জয়ন্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে খুব মৃদু স্বরে বললে, শুনছেন? দ্বিতীয় আর তৃতীয় বারে সিদ্ধেশ্বরবাবু এখানে জমা দিয়েছেন যথাক্রমে পনেরো আর বারো লক্ষ টাকা? সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবুও কি যথাক্রমে পনেরো আর বারো লক্ষ টাকা নিয়েই নিরুদ্দেশ হয়নি?

সুন্দরবাবুও মৃদুস্বরে জয়ন্তের কানে কানে বললেন, কিন্তু প্রথম দফায় ছয় লক্ষ টাকা কোথা থেকে এল।

–জোর করে কিছু বলতে চাই না। খুব সম্ভব ওটা হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর নিজের টাকা। করুণা বললে, আপনারা আর কিছু জানতে চান?

–সিদ্ধেশ্বরবাবুর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানেন?

–বিশেষ কিছুই জানি না! মানিক শুধালে, আচ্ছা করুণা, বছর দেড়েক আগে কোনও প্রাচীন মহিলা কি সিদ্ধেশ্বরবাবুর অতিথি হয়েছিলেন?

করুণা একটু ভেবে বললে, দ্যাখো মানিক, বছর দেড়েক আগেকার কথা আমি ঠিকঠাক জানি না। তবে একথা শুনেছি বটে, বছর দেড়েক আগে সিদ্ধেশ্বরবাবু একটি অতি বৃদ্ধাকে নিয়ে সুলতানপুর স্টেশনে এসে নেমেছিলেন।

–তারই কিছুদিন পরে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকও ওখানে এসেছিলেন।

এও আমার শোনা কথা মানিক। শুনেছি, সে ভদ্রলোকও গিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়িতে। কিন্তু–

–থামলে কেন, কিন্তু কী?

কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে করুণা বললে, ভাই মানিক সিদ্ধেশ্বরবাবুর সম্বন্ধে অনেক কানাঘুষাই শুনতে পাই। কিন্তু শোনা কথা পরের কাছে প্রকাশ করতে ভয় হয়।

করুণার পৃষ্ঠদেশে একটি সাদর চপেটাঘাত করে মানিক অভিযোগ ভরা কণ্ঠে বললে, করুণা আমিও কিন্তু তোমার পর। কোনও ভয় নেই, তোমার শোনা কথাই প্রকাশ করো।

করুণা বললে, শুনেছি সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাংলোয় একটি বৃদ্ধা নারী আর একটি বৃদ্ধ পুরুষ প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাদের প্রস্থান করতে দেখেনি! কেবল তাই নয় তারা যে এখনও ওই বাংলোর ভিতরে আছেন, এমন কোনও প্রমাণও নেই।

–এ যে অসম্ভব কথা?

করুণা প্রায় আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠেই বললে, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তুমি জিজ্ঞাসা করছ বলেই। বলছি, সিদ্ধেশ্বরবাবুর ওই রহস্যময় বাংলো সম্বন্ধে আরও যেসব কানাকানি শুনতে পাই। তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

–তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।

–লোকে বলে, ও বাংলো হচ্ছে ভূতুড়ে।

–কেন?

–ওখানে নাকি কাচের দুটো কফিনের মধ্যে

–কাচের কফিন।

–হ্যাঁ! ওখানে নাকি কাচের দুটো কফিনের মধ্যে একটি পুরুষ আর একটি নারীর মৃতদেহ।

সুন্দরবাবু চমকে উঠে প্রায় গর্জন করে বললে, হুম! হুম!

ঠিক সেই সময় ঘরের ভিতরে ঢুকল একজন ভৃত্য। সে বললে, সিদ্ধেশ্বরবাবু দেখা করতে এসেছেন।

সচমকে সকলে করলে দৃষ্টি বিনিময়।

করুণা বললে, বেশ তাকে নিয়ে এসো।

মিনিট-দুয়েক পরেই ঘরের দরজার কাছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর আবির্ভাব। মানিকের আঁকা ছবির বারো-আনাই মিলে যায় তার চেহারার সঙ্গে। ব্যস্তভাবে সকলের মুখের উপরে একবার বিদ্যুৎবেগে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, করুণাবাবু, আপনার ঘরে আজ। অনেক অতিথি দেখছি। আমি জানতুম না, মাপ করবেন, আর-একদিন আসব! বলতে বলতে সিদ্ধেশ্বরের অন্তর্ধান।

সুন্দরবাবু তার দোদুল্যমান ভূঁড়িকে রীতিমতো কাহিল করে তড়াক করে এক সুদীর্ঘ লম্ফ মেরে সচিৎকারে বললেন, পাকড়াও, পাকড়াও মনোহর মিত্তির লম্বা দিচ্ছেন? ওকে গ্রেপ্তার করো। ওকে গুলি করে মারো।

জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে সুন্দরবাবুর কাধ চেপে ধরে কঠোর কণ্ঠে বললে, শান্ত হোন সুন্দরবাবুর শান্ত হোন! লম্ফঝম্প আর চিৎকার করে ভাড়ামি করবেন না। আসুন, দেখা যাক মনোহরবাবু এর পরে কী করেন!

তারপর ব্যাংকের বারান্দায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তায় মনোহরবাবু তার মোটরবাইক চালিয়ে দিয়েছেন সবেগে।

সুন্দরবাবু বললেন, এখন আমরা কী করব? নীচে নেমে গিয়ে মোটরে চড়ে মনোহরের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারি বটে, কিও ৩৩ক্ষণে আসামি আমাদের নাগালের বাইরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

করুণার দিকে ফিরে জয়ন্ত বলল, আপনি তো মনোহরবাবুর বাংলোয় যাবার রাস্তা জানেন?

–জানি।

—তাহলে কালবিলম্ব না করে আমাদের সঙ্গে আসুন। মনোহরবাবু তো বাংলোখানা তার কফিন দুটো কাঁধে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। আগে দেখা যাক তাঁর বিরুদ্ধে।

কী কী প্রমাণ আছে, তারপর, তাকে পুনরাবিষ্কার করতে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।

সকলে পুলিশজিপের উপর চড়ে বসল এবং সঙ্গে সঙ্গে চলল কয়েকজন সামরিক পুলিশ।

খানিকক্ষণ পরেই পিছনে পড়ে রইল সুলতানপুর এবং সামনে এগিয়ে এল ভূ-স্বর্গের বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্য।

কিছুক্ষণের মধ্যে বেগমপুরাও পিছনে গিয়ে পড়ল। সামনে এবার দুরারোহ পর্বতমালার তলায় মাথা তুলে দাঁড়ানো দুর্গম অরণ্য এবং তারই বক্ষ ভেদ করে অগ্রসর হয়েছে সর্পিল গতিতে একটি নাতিবৃহৎ পথ। সেই জনহীন পথে নীরবতা তন্দ্রাভঙ্গ করে ছুটে চলল জিপ।

মানিক বললে, এমন জায়গাতেও মানুষ থাকে।

সুন্দরবাবু বললেন, মনোহর মানুষ নয়, সে অমানুষ! নিজের যোগ্য জায়গাই বেছে নিয়েছে। কিন্তু আমার খালি খালি এই কথাই মনে হচ্ছে, জয়ন্ত কেমন করে সন্দেহ করলে যে সুলতানপুর চৌধুরি ব্যাংকের সঙ্গে মনোহরের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে?

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, আন্দাজ সুন্দরবাবু, আন্দাজ। আমার বিশেষ অটুট কোনও যুক্তি নেই, আন্দাজেই ছুড়েছি অন্ধকারে ঢিল।

—হুম, আন্দাজটা কি শুনতে পারি না?

-গোড়া থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, মনোহরবাবু বাসা বেঁধেছেন সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকার মধ্যেই। এতে ধরে নিলুম, যথাক্রমে পনেরো লক্ষ আর বারো লক্ষ টাকা নিয়ে সুশীলা আর গোবিন্দবাবু তাঁরই কাছে গিয়ে হয়েছেন নিরুদ্দেশ। সাতাশ লক্ষ টাকা হস্তগত করে নিশ্চয়ই তিনি নির্বোধের মতো বাড়ির ভিতরে রেখে দেবেন না।

বাড়িতে চোর-ডাকাতের ভয়, ওদিকে ব্যাংকে রাখলে টাকা সুদে বাড়ে। তারপর ও-টাকার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। মনোহরবাবুর চিঠির একটা জায়গা স্মরণ করুন। গোবিন্দবাবুকে তিনি লিখেছিলেন—যতদিন না আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ততদিন আমরা এখানেই বাস করব। কিন্তু মানুষের খাওয়া-পরার জন্যে দরকার হয় টাকার। টাকা আগাছার মতন আপনাআপনি মাটি খুঁড়ে গজিয়ে ওঠে না। নিজের ভরণপোষণের জন্য মনোহরবাবু নিশ্চয়ই কিছু টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখবেন। সুতরাং কোনও না কোনও দিক দিয়ে তার সঙ্গে যে ব্যাংকের সম্পর্ক আছে, এটা আমি আগে থাকতেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। অবশ্য আন্দাজ মাত্র।

সুন্দরবাবু তারিফ করে বললে, বা রে আন্দাজ! বলিহারি।

করুণা বললে, ওই সিদ্ধেশ্বর—অর্থাৎ মনোহরবাবুর বাংলো দেখা যাচ্ছে।

সুন্দরবাবুর বললেন, মনোহরহীন মনোহরের বাংলোর ভিতরে আছে হয়তো এয়ারটাইট কাচের কফিনের মধ্যে দটো বুড়ো-বুড়ির কতদিনের বাসি শুকনো মড়া! বাবা, এ কী রকম বাংলো। চারদিকে জনজঙ্গল আর ঝোপঝাড়, উপর থেকে মাথার উপরে ঝপ খাবে বলে হুমড়ি খেয়ে আছে প্রকাণ্ড কালো পাহাড়। এ যেন হানাবাড়ি। গা ছম ছম করে ওঠে। মনোহরটা বোধ হয় এখানে বসে শবসাধনা করত। সে মন্ত্র পড়ে দিলে মড়াদুটো জ্যান্ত হয়ে উঠত। এত কাঠখড় পুড়িয়ে তান্ত্রিক খুনিটাকে ধরতে পারলুম না, আমার এ আফসোস রাখবার ঠাঁই নেই। কপাল!

গাড়ি ফণি-মনসার বেড়া দিয়ে ঘেরা একখানা সুদীর্ঘ একতলা বাড়ির সামনেকার খোলা জমির উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

।। পাঁচ ।। ঘোড়শী ললিতা দেবী

সারি সারি ঘর। সামনে টানা চওড়া দালান। জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ঘুঘুর কান্নার সুর, তা ছাড়া আর কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। এ যেন এক অপরিসীম বিজনতার রাজ্য। স্তব্ধতার মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে সত্যসত্যই।

স্বভাবত উচ্চকণ্ঠ সুন্দরবাবুও সেখানে চেঁচিয়ে কথা কইতে পারলেন না–সেখানে চিৎকার করাও কী যেন নিয়মবিরুদ্ধ। চুপিচুপি বললেন, মনোহরের লোকজনরাও কি আমাদের গাড়ির সাড়া পেয়ে চম্পট দিয়েছে?

–অসম্ভব নয়। দেখা যাক, এই বলে জয়ন্ত অগ্রসর হয়ে দালানে গিয়ে উঠল, তার পিছনে পিছনে চলল আর সকলে। নিজের পায়ের শব্দে তারা নিজেরাই উঠতে লাগল। চমকে।

দালানের উপর দাঁড়িয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখলে জয়ন্ত! তারপর সামনের একটা ঘরের দিকে সোজা এগিয়ে গেল

এবং সঙ্গে সঙ্গে সুগম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল–ওদিকে নয়, ওদিকে নয়,–এদিকে আসুন–আপনার বাঁ দিকের শেষ ঘর।

সচকিত প্রাণের নকলে ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মতো।

সুন্দরবাবু এতক্ষণ দেখতে পাননি–বাঁ-দিকের শেষ ঘরের পর্দা দেওয়া দরজার দুই পাশে দাঁড় করানো রয়েছে দুটো সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নরকঙ্কাল।

আঁতকে উঠে অস্ফুটকণ্ঠে তিনি বললেন, আর নয়, এইবেলা সরে পড়ি এসো! মড়ার হাড় এখানে কথা কয়?

সেই কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, ভয় নেই! ও দুটো হচ্ছে রক্তমাংসহীন কঙ্কাল মাত্রা নির্ভয়ে ঘরের ভিতরে আসুন।

আকস্মিক কণ্ঠস্বর শুনে জয়ন্ত কেবল বিস্মিত হয়েছিল! ঘরের ভিতর থেকে কে বললে, পর্দা ঠেলে পবেশ করুন।

দুই হাতে দুই দিকে পর্দা সরিয়ে জয়ত্ত ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। সামনেই একখানা ইজিচেয়ারের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় স্বয়ং ডাক্তার মনোহর মিত্র।

এ দৃশ্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত। হতভম্ব হয়ে গেল জয়ন্ত পর্যন্ত।

মনোহরের গম্ভীর মুখের ওষ্ঠাধরের উপরে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল যেন একটুখানি হাসির ঝিলিক। তিনি বললেন আমি পালাইনি দেখে অবাক হচ্ছেন? অবাক না হলেও চলবে। আপনারা শুভাগমন করবেন জেনেই আমি এখানে আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছি। আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, এখানে আসনের অভাব হবে না।

পিছন থেকে সুন্দরবাবু বলে উঠলে, হুম! ছদ্মনামের আড়ালে যে লোক তেত্রিশ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে, তার বাড়িতে আসনের অভাব হবে না, আমি তা জানি!

মনোহরের একটুও ভাবান্তর হল না! খুব সহজ, স্থিরকণ্ঠে তিনি বললেন, নানা কারণে সময়ে আত্মগোপন করবার দরকার হয় অনেকেরই—এমন কি আপনাদেরও!

—আমরা মাঝে মাঝে আত্মগোপন অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করি অসাধুদের শাস্তি দেবার জন্য। কিন্তু তুমি?

কালো চশমার আড়ালে মনোহরের দুই-চক্ষু ক্রোধে দীপ্ত হয়ে উঠল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল অত্যন্ত কঠিন। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, আমি মহাশয়ের চেয়ে বয়সেও বড়ো, বিদ্যা-বুদ্ধি মান সম্ভ্রমেও বোধহয় ছোটো নই। আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করে ভদ্রতার অপমান না করলেই বাধিত হব। আপনারা অসাধুদের দণ্ড দেবার জন্যে ছদ্মবেশ ধারণ করেন, কেমন? তাহলে জানবেন, আমিও ছদ্মনাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্যে।

সুন্দরবাবু টিটকিরি দিয়ে বলে উঠলেন, ও হো-হো-হো! মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর অভিনব যিশুখ্রিস্ট। তাই তিনি সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবুকে হত্যা করে কাচের কফিনে পুরে রেখে দিয়েছেন। তাই তিনি ওই দুই হতভাগ্যের কাছ থেকে সাতাশ লক্ষ টাকা অপহরণ করে ধরা পড়বার ভয়ে ছদ্মনামের আশ্রয়ে ব্যাংকে জমা দিয়েছেন। এর পর কী করা উচিত বলুন দেখি? আপনাকে সাধুবাদ দেব, না হাতকড়া আনবার হুকুম দেব?

এতটুকুও বিচলিত না হয়ে স্থির কণ্ঠে মনোহর বললেন, লোকে আমাকে অপবাদ দেয়– আমি নাকি হাসতে জানি না। কিন্তু আপনার কথা শুনে আজ আমার প্রাণপণ অট্টহাস্য করবার ইচ্ছে হচ্ছে। আমি সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবুকে হত্যা করেছি? কোন প্রত্যক্ষদর্শী আপনার কানে এই অপূর্ব খবরটি দিয়ে গিয়েছে?

–দেখুন বাপ্পা দিয়ে আপনি আমাকে গুলোবার চেষ্টা করবেন না। বলতে পারেন সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু আজ কোথায়?

–তাঁরা এই বাড়িতেই আছেন।

–হ্যাঁ, কাচের কফিনের ভিতর।

–বারবার কাচের কফিন বলে চিৎকার করবেন না। আমার বাড়িতে কফিন বলে কোনও জিনিসই নেই।

–বটে, বটে–হুম এখানে কাচের কফিন আছে, কি না আছে, সেটা খানাতল্লাশ করলেই জানতে পারা যাবে।

এতক্ষণ পরে মনোহর হঠাৎ সিধে হয়ে উঠে বসে বললেন, কাচের কফিনের কথা ছেড়ে দিন। খানি আগে জীবন্ত অবস্থায় কাকে দেখতে চান? সুশীলা দেবীকে, না গোবিন্দবাবুকে?

সুন্দরবাবু প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর বাধো বাধো গলায় বললেন, কোথায় সুশীলা দেবী? আগে তাঁকেই দেখতে চাই।

উত্তম। বলেই মনোহর গলা চড়িয়ে ডাকলেন সুশীলা! সুশীলা।

বাড়ির ভিতর থেকে গানের মতন একটি আওয়াজ শোনা গেল।

–আজ্ঞে? কী বলছেন?

–তুমি একবার এই ঘরে এে তো মা।

ঘরের ভিতরকার একটি দরজ, পর্দা ঠেলে আত্মপ্রকাশ করল যে আশ্চর্য রূপবতী ও মহিমাময়ী মূর্তি, তাকে দেখবার জন্যে কেহই প্রস্তুত ছিল না। এ মূর্তি যে মাটির পৃথিবীর, স্বচক্ষে দেখেও কেউ তা বিশ্বাস করতে পারল না।

বিপুল বিস্ময়ে জয়ন্ত বলে উঠল, ইনিই কি সুশীলা দেবী?

মনোহর বললেন, হ্যাঁ? কিন্তু এখন থেকে ইনি নতুন নামে আত্মপরিচয় দেবেন।

–নতুন নাম?

–হ্যাঁ, ললিতা দেবী।

।। ছয় ।। মাতৃভাষার দৌড়

সুন্দরবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, হুম। ইনি ললিতা দেবী বা পলিতা দেবী হতে পারেন, কিন্তু ইনি সুশীলা দেবী নন!

–কেন বলুন দেখি?

–সুশীলা দেবীর বয়স পঁচাত্তর বৎসর।

–ঠিক। এখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর হলেও তিনি আর বৃদ্ধা নন।

–পাগলের মতন কী আবোল-তাবোল বকছেন।

–সুশীলা দেবী নবযৌবন লাভ করেছেন।

–শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করবেন না মনোহরবাবু।

–কেন প্রাচীনরা কি আবার নবীনা হতে পারে না?

–অসম্ভব! জরার পর মৃত্যু, জরার পর যৌবন নেই।

–বিজ্ঞানের মহিমায় সবই সম্ভবপর হয়। আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি বিজ্ঞান একদিন মানুষকে অমর করবে।

–আপনার ওই নির্বোধের স্বর্গে আমাদের টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। হয় কাজের কথা বলুন, নয়–

–নয়?

–নয় থানায় চলুন।

–বেশ, তবে কাজের কথাই শুনুন। মনোহর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন মা সুশীলা।

–বাবা!

সেকি মানুষের কণ্ঠস্বর, না বীণার ঝঙ্কার।

–তুমি এখন বাড়ির ভিতরে যাও। এই ভদ্রলোকদের জন্য একটু চা-টা পাঠিয়ে দাও। সুন্দরবাবু ব্যস্তভাবে সভয়ে বলে উঠলেন, না, না এখানে আমরা চা-টা খেতে আসিনি!

–ভয় নেই, আপনাদের চায়ে কেউ বিষ মিশিয়ে দেবে না।

–বিষ থাক আর না থাক এখানে চা আর টা কিছুই খাওয়া চলতে পারে না।

–আপনাদের সকলেরই কি এক মত? জয়ন্ত বললে, আমার অন্য মত। আমি চা-টা সব খাব। কী বলো মানিক?

–আমিও তোমার দলে।

–করুণাবাবু কী বলেন। পরমাসুন্দরী সুশীলা–ওঁকে কি ললিতা দেবী বলে ডাকব মনোহরবাবু?

–ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

আবার বাজল সেই অমৃয়মান কণ্ঠস্বরের মোহনীয় বীণাবেণু! বাবার কাছে আমি সুশীলা! কিন্তু আপনারা তো বৃদ্ধা সুশীলাকে দেখেননি আপনারা আমাকে ললিতা বলেই ডাকুন।

জয়ন্ত বললে, বেশ! করুণাবাবু, এই পরমাসুন্দরী ললিতা দেবী যদি তার সুন্দর হাত দিয়ে সুন্দর চা তৈরি করে দেন, তাহলে সুন্দরবাবুর মতো আপনি তা পান করবেন না?

–করব না, বলেন কী? আমি তো নির্বোধ নই।

–সুন্দরবাবু, আপনি কি এখনও মত বদলাবেন না? মনে রাখবেন চায়ের সঙ্গে আবার টা।

সুন্দরবাবু জুলজুল করে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—কী আর করি বলো! তোমরা সবাই যখন রাজি তখন আমারও আর একযাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন? আমিও রাজি।

ললিতা দেবীর গোলাপ-পেলব ওষ্ঠাধরে ফুটল যে মিষ্টি হাসিটুকু তাও যেন নীরব সংগীতের মতো সুন্দর। একটি নমস্কার করে পাশের ঘরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন জীবন্ত স্বপ্নপ্রতিমার মতো।

মনোহর গম্ভীর স্বরে বললেন, শুনুন মশাই। জরার কারণ কী মানুষ যে জানে না, এ কথা সত্য নয়। বরং এই কথাই সত্য যে জরার কারণ তার কাছে অজ্ঞাত নয়, এইটুকুই। জানে না সে।

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বললেন, বাবা এ যে হেঁয়ালি।

—এ সব সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আপনাদের যে কেমন করে বোঝাব বুঝতে পারছি। Radioactive বস্তু কাকে বলে জানেন?

জয়ন্ত বললে, জানি। আমাকেও মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে হয়, যদিও তা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

–সুন্দরবাবু বললেন, বিজ্ঞানে আমি একেবারে মা! বাংলায় বুঝিয়ে দিতে পারেন?

—ইংরেজি তো পদে আছে, বাংলায় শুনলে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

—তাও কখনও হয়? বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

—আমাদের মাতৃভাষার অভিধানে Radioactive-এর অর্থ এই ভাবে বোঝানো হয়েছে; আংশুবিকিরণ দ্বারা বিদ্যুৎসাপক প্রভৃতির উপর ক্রিয়াকরণক্ষম; (রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম,

পলনিয়াম প্রভৃতি সম্পর্কে অপারদর্শকপদার্থ ভেদকারক ও বৈদ্যুতিক ক্রিয়াজনক এবং অদৃশ্য কিরণবিকরণক্ষম।) কী বুঝলেন বলুন।

সুন্দরবাবু বললেন, ব্যাপার বুঝব কী, আরও গুলিয়ে গেল। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে! এইজন্যেই কি কবি গান বেঁধেছেন—আমরি বাংলা ভাষা?

–বাংলা ভাষার দোষ নেই সুন্দরবাবু, তবে বাংলা ভাষায় এখনও ভালো করে বিজ্ঞানকে পরিপাক করবার চেষ্টা হয়নি কারণ দেশ এতদিন স্বাধীন ছিল না, যাক ও-কথা। যতটা সংক্ষেপে পারি কিছু কিছু বোঝাবার চেষ্টা করি। অনেক পরীক্ষার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যে, সারাজীবন ধরে আমাদের দেহের ভিতরে যে Radioactive বস্তু জমে ওঠে, অর্থাৎ যাকে বলে ক্রমিক radium জরার কারণ হচ্ছে তাই। সূর্যের দ্বারা পৃথিবীর উপরে প্রতিদিনই radium নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আমরা তা খাচ্ছি, আমরা তা পান করছি, নিশ্বাস দিয়ে বাতাস থেকে তা আকর্ষণ করছি। তারই ফলে প্রত্যেক জীব আর তরুলতাও ধীরে ধীরে জরাগ্রস্ত হয়। জরাব্যাধি নিবারণ করবার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

সুন্দরবাবু দুই চোখ ছানাবড়ার মতন করে বললেন, বলেন কী মশাই!

–আজ্ঞে হ্যাঁ Calcium থেকে দেহের হাড় তৈরি হয়। রসায়ন শাস্ত্রের দিক থেকে। radium কাজ করে calcium-এরই মতো। গঠন কার্যে যেখানে calcium-এর পরমাণু দরকার হয়, সেখানে radium পরমাণু ব্যবহার করলে দেহের রক্তস্রোত তা না জেনেই গ্রহণ। করে। Radium বিষের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাদের ভিতর থেকে ওই radium পরমাণুগুলিকে বিতাড়িত করা।

জয়ন্ত বললে, সেটা কি অসম্ভব ব্যাপার নয়?

–প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় বটে কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় মোটেই তা নয়। জরাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাড়ের ভিতর থেকে বিপজ্জনক radium পরমাণুগুলিকে বাইরে বার করে দেওয়া অসম্ভব নয় মোটেই। প্রথমে রোগীকে এমন ভিনিগার ও অ্যাসিড জাতীয়

পথ্য দিতে হবে, যাতে করে তার দেহের হাড়গুলো calcium থেকে মুক্ত হয়। এক হপ্তার পর রোগীকে আমি আবার এক হপ্তা ধরে স্বাভাবিক পথ্য দিই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এদিকেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখি যে খাদ্যের ভিতরে যে খাঁটি calcium থাকে, তার মধ্যে কিছুমাত্র Radio activity বর্তমান নেই। প্রথমে যে ভিনিগার ও অন্যান্য অ্যাসিডের পথ্য দেওয়া হয়, দেহের ক্ষতিসাধন করবার ক্ষমতা তাদের অপেক্ষাকৃত কম। ওই পথের পরমাণু গ্রহণ শক্তি বা valence আছে। তাই ওই পথ্যের আকর্ষণে আসল calcium-এর সঙ্গে দেহের ভিতর উড়ে এসে জুড়ে বসা radiumও ক্রমে ক্রমে বাইরে বেরিয়ে যায়। স্বাভাবিক পথ্যের পর দিই আবার অ্যাসিড জাতীয় পথ্য। তারপর আবার স্বাভাবিক পথ্য। এইভাবে চিকিৎসা চলে মাসের পর মাস।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, এই চিকিৎসার ফলেই জরাগ্রস্ত রোগী ফিরে পায় তার নবযৌবন?

—প্রায় তাই বললেও চলে। তবে উপসর্গ যে দেখা না যায় তা বলা চলে না। যেমন ওই কাচের কফিন ব্যাপারটা। সুন্দরবাবু কাচের কফিনের উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু সেটা যে কী পদার্থ আপনারা কেউ তা জানেন না, দেখতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন।

।। সাত ।। মানুষ-গুটিপোকা

মনোহরের সঙ্গে সকলে এসে উপস্থিত হল প্রকাণ্ড একখানা হলঘরে। তার অধিকাংশ জুড়ে বিরাজ করছে নানানরকম যন্ত্রপাতি। যাঁরা কোনও কলেজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার দেখেছেন, তাদের কাছে ওসব যন্ত্রের কয়েকটি পরিচিত বলে মনে হবে।

কোথাও একাধিক bunsen-এর অত্যন্ত তপ্ত উত্তাপসঞ্চালক প্রদীপবিশেষ। উপরে টগবগ করে ফুটছে still বা অপোযন্ত্রগুলো, কোথাও সারি সারি কিলক থেকে ঝুলছে condenser বা সংহতিযন্ত্র যা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে দেখা যায় না।

সুন্দরবাবু আবার হুম শব্দটি উচ্চারণ করে বললেন, মনোহরবাবু এতক্ষণ কানে যা শুনলুম তার একবর্ণও বুঝতে পারলুম না। এখন চোখে দেখছি তাও ভালো করে বুঝতে পারছি না। আপনি বোধ হয় আবার লেকচার শুরু করবেন? কিন্তু তার আগে আমার গোটাকয় সহজ প্রশ্নের জবাব দেবেন?

—আজ্ঞা করুন।

—আপনি এই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তো কলকাতায় বসেই করতে পারতেন? মিথ্যে এত লুকোচুরি কেন!

—কলকাতার কৌতূহলী জনতা যদি ঘুণাক্ষরেও আমার পরীক্ষার ব্যাপার টের পেত, তাহলে আমার বাড়িটি পরিণত হত সরকারি বাগানে আর সেখানে উঁকিঝুঁকি মারতে আসত রাম-শ্যাম যদু-মধু সকলেই। তারপরেও আমি কি আর নির্বিঘ্নে পরীক্ষা চালাবার অবসর পেতুম?

—সে-কথা ঠিক। কিন্তু সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু কাউকে কিছু না জানিয়ে আপনার সঙ্গে অমন চোরের মতন পালিয়ে এসেছেন কেন?

তারও প্রথম কারণ হচ্ছে মন্ত্রগুপ্তি। দ্বিতীয় কারণ গুরুতর।

—গুরুতর মানে?

—সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু নতুন দেহ লাভ করবার পর ইহজীবনে আর নিজের নিজের বাড়িতে ফিরবেন না বোধ হয়।

—সে কী মশাই?

—হ্যাঁ। সেই জন্যেই সুশীলা আজ ললিতা নাম ধারণ করেছেন।

—কিন্তু কেন, কেন, কেন?

–নতুন দেহ অতি প্রাচীনা সুশীলাকে কেউ কি চিনতে পারত?

–তা পারতই না–হুম! –সুশীলার কথা কেউ বিশ্বাস করত?

–তা তো করতই না-ঠিক?

–তাকে নিয়ে আরও নানারকম গণ্ডগোল–এমনকি মামলা-মোকদ্দমা হবারও সম্ভাবনা ছিল না কি?

–তা তো ছিলই হ্যাঁ?

–আরও কত দিক দিয়ে সুশীলার জীবন হয়ে উঠত ভয়াবহ। সেইজন্যে স্থির করেছিল, আমার পরীক্ষা সফল হল নতুন দেহে নতুন নামে নতুন ভাবে জীবন যাপন করবে। গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধেও ওই কথা।

–সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু অত টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কেন? আর সে-সব টাকা আপনার নামেই বা জমা আছে কেন?

নতুন দেশে নতুন নামে নতুন নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে হলে প্রথমেই দরকার টাকা। সে টাকা আসবে কোথা থেকে? নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যেই সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু উচিত মতো টাকা সঙ্গে করে এখানে এসেছেন। ওঁদের টাকা আমার ছদ্মনামে জমা রেখেছি কেন? আমি জানতুম পুলিশ ওঁদের খোঁজ করবে। ওঁদের নামে টাকা জমা রাখলে পুলিশ নিশ্চয় সন্ধান পেত। আর কোনও প্রশ্ন আছে?

–আর একটি প্রশ্ন। যদিও ললিতা দেবীই সুশীলা দেবী কি না সে খটকা আমার মন থেকে এখনও দূর হয়নি তবে ওটা আপাতত ধামাচাপাই থাক! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গোবিন্দবাবু কোথায়?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মনোহর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, জয়ন্তবাবু যে উপসর্গের কথা বলছিলুম, এইবার সেটা দেখবেন আসুন।

মনোহর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন একখানা খাটের পাশে। সেখানে শয্যার উপরে যে শায়িত মূর্তিটি ছিল তাকে দেখেই সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল পরম বিস্ময়ে।

একটি তরুণ, অব সুন্দর মূর্তি বালক বললেও চলে। সুগঠিত শুভ্র নগ্ন দেহ—যেন গ্রীক-ভাস্করের হাতে গড়া! কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সর্বাঙ্গ তার কাচ দিয়ে মোড়া এবং সেই কাচ তা কেউ গলিয়ে এমন ভাবে মূর্তির উপরে ঠেলে দিয়েছে যে সারা দেহের সঙ্গে তা অচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে।

মনোহর বললেন, সুন্দরবাবু এই আপনার কাচের কফিন।

—হুম, কিন্তু কাচের কফিনের ভিতর ওটা কী রয়েছে? রঙিন মোমের পুতুল? না মৃতদেহ?

—আরও কাছে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।

–না, ওটা মোমের পুতুল নয়, মৃতদেহও নয়। ও যে জীবন্ত ওর সর্বাঙ্গে যে জীবনের রং জীবনের আভাস এমনকি দুই মুদিত চোখের পাতাও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

মনোহর বললেন ও এখনও ঘুমোচ্ছ, কিন্তু ওর ঘুম ভাঙতে আর বেশি দেরি নেই।

জয়ন্ত শুধোলে, আসল ব্যাপারটা কী মনোহরবাবু?

—আমি নিজেই জানি না। ওই কাচের আবরণী আমার সৃষ্ট নয়। পর্যাক্রমে calcium পথ্য দিয়ে, আবার তা বন্ধ করে বেশ কিছুকাল চিকিৎসা চালাবার পর রোগী হঠাৎ দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আর তার সর্বাঙ্গব্যাপী দেখা দেয় ওই কাচের আবরণ। কিছুকাল পরে রোগীর ঘুম ভাঙে, কাচের আবরণ ফেটে যায়, তারপর উঠে বসে তার জাগ্রত মূর্তি! এর অর্থ আমিও জানি না।

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, বাবা এ যে মানুষ গুটিপোকা!

মানিক শুধোলে, ও মূর্তিটি কার?

–গোবিন্দবাবুর।

–তাঁর বয়স তো সত্তর বৎসর?

সকলে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

সুশীলার প্রবেশ। সেই সুমধুর কণ্ঠে সে বললে, বাবা ও ঘরে খাবার দেওয়া হয়েছে।

মনোহর এতক্ষণ পরে একটু হেসে বললেন, চলুন! এই বিজন বনে আপনারা খাবারের মধ্যে কোনও বিশেষত্ব পাবেন না।

সুশীলা বললে, বাড়িতে যা ছিল তাই দিতে পেরেছি। স্যান্ডউইচ শিককাবাব, রুটি মাখন, চা আর মিষ্টান্ন।

মানিক বললে, ললিতা দেবী, চায়ের বৈঠক যে ভূরিভোজনের আসরে পরিণত হল। এই বিজন বনে শিককাবাব বানালেন কী দিয়ে? বাঘের মাংস দিয়ে নয় বোধ হয়।

–খেলেই বুঝতে পারবেন।

—আসুন সুন্দরবাবু।

–ভায়া আজ যা দেখলুম, আর শুনলুম, আমার পিলে অত্যন্ত চমকে গিয়েছে। খাওয়ার চিন্তা মোটেই জাগছে না!

—আপনার পিলে নির্বোধ নয়। একখানা স্যান্ডউইচ উদরসাৎ করলেই সে আবার অত্যন্ত শান্ত হয়ে পড়বে! আপনার ধাত জানতে আমার বাকি নেই? চলুন, মধুরেণ সমাপয়েৎ করে আসি।